সত্যায়ন
প্রকাশন

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-57-4

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১

সম্পাদক : আসিফ আদনান

শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩৯২ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
facebook.com/ sottayonprokashon

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা | ৬
শারঈ সম্পাদকের কথা | ১৫
ভূমিকা | ১৮

সমর্পিতার স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার সমর্পণ
তিথির অতিথি | ২৪
স্বাধীনতার সাতকাহন | ২৮
সমর্পণের সাতকাহন | ৩৭
গালভরা বুলি | ৪৫
এক্সপেরিমেন্ট | ৫০
নীল আকাশে ঘুড়ি | ৫৩

সুষমা
নারী ≅ পুরুষ ? | ১০২
শুভঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত | ১১৬
সুষম | ১২৩

কর্তা, কর্তৃত্ব ও কর্তব্য
ছি! তুমি না বড় | ১৬৫
লাইসেন্স | ১৭১
অ্যাডমিন | ১৭৮
ভারকেন্দ্রে ভারসাম্য | ১৮৮
Wi-Fi রসায়ন | ১৯৪
লাইট-ক্যামেরা অ্যাকশান | ১৯৬
নেশা লাগিল রে.. | ২০৪

বিষাক্ত ক্ষমতায়ন ও তামার বিষ
ইউরো-আখ্যান | ৬১
গজফিতা | ৭২
রোজগেরে | ৭৭
পাটি রেখে মাটিতে | ৮৮

সুশিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা
পেটেন্ট | ১৩৪
মধ্যযুগীয় '...' | ১৪৩
কৌতুক | ১৫৪

দুই-তিন-চার-এক
সবেধন নীলমণি | ২১০
শাদা শাড়ির কান্না | ২১৫
ডিভোর্সী ও বিবাহিতা | ২২৫
কী দিয়া সাজাইমু তরে | ২৩০
লাগাম | ২৩৯
অতিথি | ২৪৩

পরিশিষ্ট | ২৪৭
অভিধান | ২৮৮

ভূমিকা

প্রশংসার যত ধরন হতে পারে, সবই আল-হাকিম আল-হাকাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। আর দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে, যাঁর ঋণ শোধ করা উম্মাতের পক্ষে অসম্ভব।

২০১৭ সালের আগস্টে একদম নতুন এক লেখকের একটা বই বেরিয়েছিল, প্রথম বই। লেখক চিন্তাও করতে পারেনি আপনারা সেই 'ছাইপাঁশ'কে এতখানি ভালোবেসে টেনে নেবেন। ফেসবুক পোস্টের জন্য লেখা আনাড়ি হাতের লেখাগুলো প্রতি আপনাদের সেই ভালোবাসার বদলা আমার কাছে নেই। নিঃসীম ভাণ্ডার যার, তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম আপনাদের পাওনা। ও বইয়ের কৃতিত্ব লেখকের এক চুল না, যদি কিছু থাকে তো সে আপনাদের। বলছিলাম আপনাদের 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'-এর কথা।

আল্লাহর তাওফিকে আজ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-এর দ্বিতীয় খণ্ড আপনাদের হাতে। গত বছর আনার ইচ্ছে ছিল লেখকের। কিন্তু ঐ যে বললাম, আল্লাহর তাওফীক। প্রায় ২ বছর সময় লেগে গেল। আপনাদের দুআতেই হয়েছে আসলে। আপনাদের দুআর মতো করে আল্লাহ আমাকেও কবুল করে নিক।

পড়বার আগে কিছু কথা। এক, আমি কথাসাহিত্যিক নই। সে যোগ্যতাও আমার নেই, নিজেকে সাহিত্যে পারঙ্গম করার জন্য আমার কোনো চেষ্টাও নেই, সময়ও নেই। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১ যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন আমার কমতি। আমার উদ্দেশ্য কিছু ছাড়া ছাড়া তথ্যকে কানেক্ট করে দেওয়া, যাতে পাঠকের সামনে পুরো একটা চিত্র ফুটে ওঠে। কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কিছু ইতিহাস, কিছু রাজনীতি একসাথে গেঁথে দিলে আমাদের বৃটিশবিধৌত মগজে সহজপাচ্য হয় শাশ্বত দ্বীন ইসলামের আহকামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যগুলো। আমি সেই কাজটাই করি কেবল। দেওয়াল গাঁথার সিমেন্ট হিসেবে কিছু দৃশ্যপট, কিছু চরিত্র, ডায়লগ ব্যবহার করি, ব্যস এটুকুই। এখন এর মধ্যে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প বা হুমায়ুন আহমদের ভাষাশৈলী খুঁজতে যান,

তাকে নিঃসন্দেহে হতাশ হতে হবে। ইসলামি কথাসাহিত্যের স্বাদ পেতে উস্তায আতীক উল্লাহ, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সাহেব ও আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব ভাইয়ের লেখা পড়ার সাজেশন রইল।

আরও সীমাবদ্ধতা আছে। সাহিত্যে বা ছোটোগল্পে ছোট্ট একটা ঘটনা বা উপজীব্যকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে ভাষার কারুকাজ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, চরিত্রগুলোর মনোবিশ্লেষণ করা হয়, পরিবেশের চিত্রায়ন করা হয়, আবেগের চিত্রায়ন করা হয়। যেটা তথ্য-যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সম্ভব না। তা হলে টানতে টানতে অনেক বড়ো হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নত সাহিত্যরস আপনি এ বইয়ে পাবেন না, এ আমি আগেই বলে রাখলুম।

আমার উদ্দেশ্য মূল চরিত্রের মাধ্যমে আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়া, আমার যুক্তিগুলো আপনাকে দেওয়া। তাই মূল চরিত্রকে বেশি কথা বলতে হবে। আর সামনে উপবিষ্ট চরিত্রকে কম কথা বলতে হবে। দুজনই সমান অ্যাটাক-কাউন্টার অ্যাটাকে গেলে তো কথাই ফুরোবে না। গল্পও শেষ হবে না, আমার কথাও আপনাকে বলা হবে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মূল চরিত্র ডোমিনেট করবে ডায়লগে, যা বাস্তবে হয় না। পাঠককে বাস্তবের ফিলিংস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য জাস্ট ইনফরমেশন আর আর্গুমেন্টগুলো আপনাকে জানানো। এজন্য প্রবন্ধ লেখাই সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের চেয়ে গল্পসল্প আমাদের বেশি পছন্দ, তাই গল্পের ঢঙটাকেই বেছে নিয়েছি। ফলে সমস্যা যেটা হয়েছে, ডায়লগে সব তথ্য দেওয়া যায় না, অংকের পরিসংখ্যান তো না-ই। খুব বেমানান লাগে যদি কেউ মুখস্থ ডিজিট বলতে থাকে। তাই ডায়লগকে স্পষ্ট করার জন্য আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের। পাঠককে অনুরোধ, অবশ্যই যথাস্থানে পরিশিষ্টটা পড়ে নেবেন। গল্পের ফ্লো নষ্ট হয় হোক, জরুরি না। জরুরি হলো টপিকটা বোঝা। পড়ার সময় শুধু একটু নাটকীয়তার সাথে পড়ে নেবেন, সাহিত্যের বসবাস তো আমাদের মনে।

আর টপিকগুলো পরস্পর কানেক্টেড, একটা আরেকটার সাথে জড়ানো। নারীমুক্তির আলোচনায় নারীশিক্ষা এসে পড়ে, আবার নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে এসে পড়ে সমানাধিকার। ফলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই হয়তো হাতেগোনা কিছু আলোচনা রিপিট হয়েছে। তবে এই বার বার উল্লেখের প্রয়োজন পাঠক নিজেই ডায়লগের পিঠে পিঠে অনুভব করবেন আশা করি। আর প্রতিটা টপিকের ইতিহাস আর দর্শন তো একটাই। নতুন নতুন পার্শ্বচরিত্র আসায় ইতিহাস আর দর্শনের খেই ধরে বার বার টানতে হয়েছে। এটা উপকারীই হবে আর প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিরক্তি আসবে না,

আশা করি। আবার এটাও দেখবেন যে, এক অধ্যায় পড়ার পর যে প্রশ্নগুলো আপনার মনে আসছে, পরের কোনো অধ্যায়ে জবাবটা এসেছে। পুরো বই শেষ করার পর একটা সামগ্রিক চিত্র সামনে এসেছে। যদি আসে, আমি সার্থক। যদি কোনোভাবে দ্বিতীয়বার পড়া যায়, সব ফকফকা, ঝলমলে রোদ্দুর।

আমি মুসলিম পুরুষদের দোষ দিই। কেন দিই সেটা বইটা পড়লে বোঝা যাবে। এখানে ছোট্ট করে একটু বলে নিই। এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার ছায়াতলে এসেছি। বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে ধারণ করেছি ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবনে হিন্দুয়ানি স্বভাব ছাড়তে পারিনি। বরং বংশ-পরম্পরায় সেই মানসিকতা বয়ে চলেছি, শিখিয়েছি সন্তানদের। প্রজন্মে প্রজন্মে আমাদের বিধবারা বাকি জীবন সাদা শাড়ি পরেছে, নবজাত কন্যা-সন্তানকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে, পণের নাম হয়েছে যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম হয়েছে কুলখানি-চল্লিশা, প্রতিমাপূজার জায়গা নিয়েছে মাজার বা পঞ্চপীরের। আমি একে বলি 'হিন্দুয়ানি ইসলাম'। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের মেয়েরা। ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, আমাদের হিন্দুয়ানি মুসলিম সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি, মানে দেয়নি আর কি। পশ্চিমা সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনার খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছতে পারিনি। আফসোস! ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম যে-জীবন তাদের দিয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের জানাশোনা ভয়ংকর রকম কম। ভার্সিটিতে যান, সেখানে ১০০ জন মেয়ের সাথে যদি আপনি ১০ মিনিট করে কথা বলেন ইসলামে নারীর অবস্থানের ব্যাপারে, ৯৫ জনের মাঝে কোনো-না-কোনো পয়েন্টে বিভিন্ন মাত্রার ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ) দেখতে পাবেন। দেখবেন কোনো একটা টপিকে হয় কুরআনের আয়াতকে, না হয় স্পষ্ট কোনো হাদীসকে সে হয় অস্বীকার করছে, না হয় এ-যুগে অচল বলে মন্তব্য করছে। ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক ও সেকেলে, আর পশ্চিমা সভ্যতাকে আধুনিক ও নারীবান্ধব বলে মনে করছে। খুব স্বাভাবিক। সে ঘরে তার মায়ের নিগৃহীত জীবন আর টিভিতে পশ্চিমের বাঁধনহারা জীবন দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে। তুলনা করেছে। দুটোর কারণই তো আমরা পুরুষরা। মোদ্দা কথা হলো আমরা পারিনি এবং করিনি। ফল হিসেবে চোখ ধাঁধানো শিশিরবিন্দুতে ধোঁকা খেয়ে পশ্চিমা মাকড়সার জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ছটফট করছে আমাদের প্রজাপতিরা।

সেই 'পুরুষজাতিগত-অপরাধবোধ' থেকে বইটা লেখা। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি পশ্চিমা সমাজের সাথে ইসলামের আদর্শিক দ্বন্দ্বটা কোথায়, কেন সবাই পশ্চিমের সাথে একাকার হতে পারছে, আর ইসলাম পারছে না। আমি দেখাতে চেয়েছি ইসলামের ব্যবহারিক প্রয়োগটা কেমন ছিল। পশ্চিমা আদর্শের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাসের একটা তুলনামূলক চিত্র পাঠক পাবেন। আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, ভাবানোর ছিল। সামনে ইন শা আল্লাহ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-৩ এর জন্য বেশি অপেক্ষা করাব না আপনাদের।

আপনাদের কাছে আরজ, পশ্চিমের করাল গ্রাস থেকে আমাদের মেয়েদের বাঁচাতে বইটা আপনার আশপাশের সর্বোচ্চ সংখ্যক বোনদের পড়াবেন। মহিলা কলেজ, মহিলা মাদরাসা, গার্লস স্কুলের ইসলামিয়াতের টিচারকে একটা করে হাদিয়া দিবেন। যাতে তাঁরা ক্লাসে এই বই থেকে কিছু কিছু আলোচনা করেন। নিজেও বইয়ের সিলেক্টেড অংশ নোট করে আড্ডায়-গল্পগুজবে শেয়ার করবেন, পারলে কিছু মুখস্থ করে ফেলবেন। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের ভুল ধারণার অপনোদন করতে হবে। আর সব ধরনের খণ্ডন হওয়া দরকার মূল কাঠামোতে গিয়ে, উপর উপর দিয়ে আর কত। উপরের গুলো খণ্ডাতে গিয়ে পশ্চিমা কাঠামোর সামনে নিজেদের লজিক্যাল প্রমাণের চেষ্টা হীনম্মন্যতার পরিচয়। বরং খণ্ডন করতে হবে ভোগবাদী মুনাফার কাঙাল পশ্চিমা কাঠামোকে। কেন আমাকে পরম ধ্রুব ধরে নিতে হবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও আধুনিকতার ধারণাকে। তারা উন্নত বলে? উন্নত তো তারা এসব মূল্যবোধ আর আধুনিকতা দিয়ে হয়নি। উন্নত হয়েছে আমাদেরই রক্ত চুষে উপনিবেশী আমলে। তবে কেন সব বিসর্জন দিয়ে তাদের মতো হবার চেষ্টা?

একটা বইয়ে অনেকের অবদান থাকে। আমি নিজের সীমাবদ্ধতা জানি। বইটা আমার বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী পড়েছেন, যেখানে যে কথা বোঝাতে পারিনি, বা সহজ করে বলা দরকার ছিল, সেগুলো তাঁরা ধরিয়ে দিয়েছেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি,যারা অভ্যস্ত পড়ুয়া-পাঠক নন, তাঁদেরও যেন বুঝতে সমস্যা না হয়। আমাদের দ্বীন প্রয়োগ হলে সমাজ-রাষ্ট্রের চিত্রটা কেমন হবে—তা বহু বছর ধরে আমাদের সামনে নেই। সেই হীনম্মন্যতা কাটাতে ইসলামের স্বর্ণযুগ ও ইসলামি সভ্যতাকে তুলে এনেছি এক এক পাতায়, দেখুন আমাদের দ্বীন আমাদের কী দিয়েছিল। সেই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হয়েছে শারীআর মেজাজ ও বিধান যেন বিকৃত না হয়, কেউ যেন 'আম্মাজান আইশা উট চালিয়েছেন বলে, এখন মেয়েদের মোটরবাইক চালাতে দিতে হবে' কিংবা 'মুসলিম সভ্যতায় বহু নারী শিক্ষকতা করেছেন, বলে ফ্রি-মিক্সিং সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন

শিক্ষকতা করা জায়েয'—এমনটা ভেবে না বসেন, সেদিকটাও লক্ষ রাখতে হয়েছে। সম্পাদক আসিফ আদনান ভাইয়ের আন্তরিক পরামর্শ ছাড়া এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া আমার কম্মো ছিল না। ইফতেখার সিফাত ভাই-ও এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। লাইন-ছাড়া হলে প্রিয় উস্তায আবদুল্লাহ আল-মাসউদ ধরে আবার ট্র্যাকে এনে দেবেন, এই ভরসা ছিল বলেই এগিয়েছি। বায়ানের প্রকাশক উস্তায ইসমাঈল ভাই খুব স্বপ্ন দেখাতে পারেন; স্বপ্নে স্বপ্নে কী যে লিখলাম, সে বিচার করেন আপনারা এবার।

পাতায় পাতায় লেখক হেসেছে, কেঁদেছে। আবেগ নাকি আবেগকে গিয়ে ছোঁয় শুনেছি। তাই যদি হয়, তবে হাসার জন্য আর কাঁদার জন্য তৈরি হোন। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে ভিজিয়ে দিন, ভিজামাটিতে প্রোথিত হোক প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, সেই বীজ থেকে জন্ম নিক লক্ষ লক্ষ দীর্ঘশ্বাস। লক্ষ দীর্ঘশ্বাসের মিলিত টাইফুন সইবার ক্ষমতা জালেম কাঠামোর নেই।

বান্দা শামসুল আরেফীন
তাং ০১/০২/২০২০

সমর্পিতার স্বাধীনতা
কিংবা
স্বাধীনতার সমর্পণ

তিথির অতিথি
স্বাধীনতার সাতকাহন
সমর্পণের সাতকাহন
গালভরা বুলি
এক্সপেরিমেন্ট
নীল আকাশে ঘুড়ি

তিথির অতিথি

মুক্তমনা, মনখানা মুক্ত যার, বাঁধনহারা—কত সুন্দর লাগে শুনতে, পাখির মতো উদ্দাম স্বাধীনতা। আচ্ছা পাখি কি স্বাধীন। উড়তে তো দেখি মুক্তভাবেই, কিন্তু পাখি কি মুক্তমনা? খাবার খোঁজা, সন্তানের জন্য সেটা বাসায় নেওয়া, দিন শেষে ফিরে আসা— এসব চিন্তায় কি ও আবদ্ধ? লক্ষ্যহীন মুক্ত কি ওর জীবন, নাকি বদ্ধ কোনো অমোঘ নিয়মে?

ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারটা ওড়ার মৌসুম। সবাই ওড়ে। পাখা গজায়, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ওড়ে। ভিকারুন্নিসার ডাকসাইটে এক্সট্রোভার্ট মেয়ে তিথি-তে বুঁদ হয়ে আছে ঢাবি'র পুরো জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট। উপস্থাপনা, গান, ক্লাস প্রেজেন্টেশন, লেখালেখি, রেজাল্ট। স্যার-ম্যাডামরা পাগল, ক্লাসমেটেরা পাগল, আর ভার্সিটির বড়ো ভাইয়া প্রজাতিটা চিরকাল ধরে পাগলই থাকে। প্রথম দু-তিনটে সেমিস্টার এভাবেই গেল। বন্ধু-আড্ডা-গান, হারিয়ে যাও। তিথি হারিয়ে যায়।

পরিবার বলতে ওর শুধুই বাবা। মা মারা যাবার পর ওর বাবা আর বিয়ে করেননি। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিথি সবার ছোটো। ওর বয়স যখন দশ তখন মা ক্যান্সারে মারা যান, মায়ের স্মৃতিগুলো তাই একটুও ফিকে না। ওর বড়ো ভাইও আর্মিতে, পোস্টিং রাজেন্দ্রপুর। আর ছোটো ভাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় গেছে পড়তে। আইয়ুব খানের মতো গোঁফে বাবাকে কত সুন্দর আর গম্ভীর লাগত, বাঘের মতো। ইদানীং বাবা আর শেভ করছেন না, অন্যরকম লাগে। অবশ্য বয়স হয়েছে তো, বয়স হলে মানুষ দাড়ি রাখে, বোরকা পরে, হজে যায়। বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল তিথি, কিন্তু বাবা এখন দেখা হলেই,

— তিথি, নামাজ হয়েছে মা?

— না, বাবা।

— তিথি মা, এখন কোথায় বের হচ্ছিস? নামাজ পড়ে বের হ।

— বাবা, এসে পড়ব।

বাবা ওকে কখনও বকেছে কি না ওর মনে পড়ে না। মা-মরা মেয়ে। আদরে আদরে মানুষ। বাবা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিচ্ছু বলে না। মা মারা যাবার পরই বাবা স্বেচ্ছায় অবসরে যান। তিথি আর ছোটো ভাইয়া তখন আর কতটুকু। বড়ো ভাইয়া ক্যাডেটে পড়ত বলে বেশি দেখভাল করতে হয়নি। কিন্তু পরের দুটোকে খাওয়ানো, গোসল করানো, পড়ানো, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, কেনাকাটা—সব বাবা একলাই করতেন, ওদের দেখাশোনার জন্যই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলেন আগে আগে। বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে তাই তিথির ভেতরটা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু কী করবে? নামাজ পড়তে একদম ইচ্ছা করে না; বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে মনে হয় আজ থেকেই পড়ব, কিন্তু হয়ে ওঠে না। সেদিন তিথি ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। গলা খাঁকারির শব্দ।

— তিথি মা, আসব?

— 'এসো বাবা'। মায়ের অনেক কিছুই পেয়েছে মেয়েটা, তার মধ্যে একটা হলো চুল, এত্ত মোটা একটা বেণী হচ্ছে।

— 'একটা কথা রাখবি, মা?' বাবা এমন করে কক্ষনো বলে না, তিথি বাবার সাথে দূরত্ব টের পায়। কতদিন বাবার সাথে একটু গল্প করা হয় না। ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে খাওয়ার টেবিলেও খুব একটা একসাথে হওয়া হয় না।

— বলো বাবা।

— ভার্সিটি থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারিস? তোকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

— 'কখন যাবে?' বেড়ানো ওর নেশার মতো। যাক, এই সুযোগে আব্বুকেও কিছু সময় দেওয়া যাবে।

— এই ধর তিনটের দিকে?

— 'আচ্ছা বাবা,আমি দুপুরের আগেই এসে পড়ব।' অনেক দিন পর বাবার মুখটুকুতে খুশি দেখা গেল।

কিন্তু... এ কেমন জায়গায় নিয়ে এল বাবা ওকে। দুই গলি পরেরই একটা বাসা। কয়েক ফ্লেভারের আইসক্রিম কিনে দিয়ে তিথিকে বাসাটায় ঢুকিয়ে দিল বাবা। দরজা থেকেই ওকে যে দুটো মেয়ে রিসিভ করল, তাদের একজন বিদেশী। সালাম দিয়েই নীল-চোখো মেয়েটা কপালে চুমু দিয়ে তিথিকে বুকে জড়িয়ে নিল। চেনা নেই জানা নেই চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, যেন কতকালের চেনা। তিথি একটু অস্বস্তিতে পড়ে

গেছে বুঝতে পেরে সাথের দেশি মেয়েটা কমফোর্ট করল,

— 'ভয় পেয়ো না, ওদের দেশে এটাই নিয়ম, চুমু দেওয়া।' অস্বস্তি ভাবটা দূর হয়ে যেতেই ওর মনে হলো, এই বিদেশী সমবয়েসী মেয়েটাকে ও বহুকাল ধরে চেনে। যেন বহু শতাব্দী আগে কোনো পাথুরে নদীর ধারে দুজনা একসাথে হেঁটেছে, পানি ছিটিয়েছে, কতকাল গল্প করেছে অজানা কোনো ভাষায় ।

— 'মাসমুহা?' দেশিনীর দিকে চেয়ে বিদেশিনীর 'গহীন থেকে উঠে আসা' প্রশ্ন।

— তোমার নাম কি গো? জিজ্ঞেস করছে।

— 'তিথি।' ভারি মজা তো।

— ইসমুহা তিথি।

— 'তিতি। আনা যাইনাব।' বুকে হাত দিল নীলনয়না।

— ওর নাম যাইনাব, আর আমি নাদিয়া। ভিতরে এসো, আমার আব্বু বলেছিলেন তুমি আসবে।

একটা রুমে পাশাপাশি দুটো জায়গায় গোল হয়ে বসে মহিলারা কথা বলছে নিজেদের ভেতর। একজন বয়স্ক মহিলা বিদেশী ভাষায় কী যেন বলছে, মনে হলো আরবি। আর পাশেরটায় একজন বাংলায় সেটা অনুবাদ করছে। তিথিকে নিয়ে যাইনাব বাংলাতেই বসল। পবিত্রতা অর্জনের উপর আলোচনা চলছে, মেয়েদের বিভিন্ন সময় যে পবিত্রতা অর্জন করার দরকার হয় সেগুলো, গোসল, ওযু। তিথি এগুলোতে খুব একটা খেয়াল নেই। ও বিদেশী মহিলাগুলোকে দেখছিল, এত্তগুলা বিদেশী মানুষ। চোখে চোখ পড়ায় হাসি বিনিময় হলো এক আধা নিগ্রো মেয়ের সাথে, অপূর্ব, কালো হলেও কী চোখ-নাক, কী হাসি। যাইনাব আর কালো মেয়েটা ছাড়া বাকিরা মধ্যবয়েসী। আরেকটা জিনিস খেয়াল করল, আরবি ভাষাটা বেহদ গর্জিয়াস, বিশেষ করে 'হা' আর 'আইনে'র উচ্চারণ বাজে কানে, গম্ভীর ও মধুর, একই সাথে।

একটু পরেই নাদিয়া ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসেছে আরেক ঘরে। সেখানে অয়েলক্লথের উপর একগাদা জিনিস—চকলেট, আইসক্রিম, কাজুবাদাম, খেজুর, ফিরনি।

— নাও গো, শুরু কর। বুঝেছি তোমার মন টানছিলো না ওখানে।

— না না, একদম না।

— 'বাসায় বিদেশী জামাত এসেছে বুঝলে। যাইনাব সিরিয়ান। কালো মেয়েটা মারইয়াম

সোমালি, আর বাকিরা জর্ডান আর ইয়েমেনের। যাইনাব এসেছে বাবার সাথে, বাকিরা স্বামীদের সাথে। পুরুষেরা আছে মসজিদে।' নাদিয়া পরিচিতদের মতো কথা বলছে, ভূমিকা টুমিকা ছাড়া।

– আপনার বাসায় ওনারা মাঝে মাঝেই আসে?

– না না, ওদের সাথে আর কোনোদিন দেখাই হবে না। অন্য বিদেশী মানুষরা আসে, দেশী মানুষরা আসে। আরে নাও না, তোমাকে তো খেতেই দিচ্ছি না কথা বলে বলে।

নাদিয়া আপু ঢাকা মেডিকেলে পড়ে ফাইনাল ইয়ারে। আপুও এক্স-ভিএনসি। হাবিজাবি প্যাঁচাল পাড়তে পাড়ে খুব। তবে একটা সম্মোহন আছে। খুব আপন হয়ে গেল তিথি। এর মধ্যে যাইনাব এসে একটা বাটিতে রেখে গেল 'তীন' ফল । যাইনাব মেয়েটার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভাষার কারণে বলা যাচ্ছে না। আপুর সাথে আরবিতে কী কী জানি বলে চলে গেল। আচ্ছা ও ইংরেজি পারে না?

– ক্যান ইউ স্পীক ইংলিশ, যাইনাব?

– 'ইয়েস, বাৎ নৎ দ্যাৎ ফ্লুয়েন্ত। স্লোলি স্লোলি, আই আন্দারস্ত্যান্দ।' মিডল ইস্টার্ন উচ্চারণ, আল জাজিরায় শোনা যায় প্রায়ই। ইংরেজি অতটা ভালো পারে না, আস্তে আস্তে বললে বোঝে।

রাজ্যের প্যাঁচাল হলো এরপর। ওর বয়েস সতেরো। ওদের দেশে যুদ্ধ চলছে, কলেজ গেছে বন্ধ হয়ে । বান্ধবীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে তুর্ক মুলুকে, ইউরোপে চলে গেছে। আর ওরা চলে এসেছে গ্রামে। তিন ভাই আহরার আশ শামে, ওর পরে আরও দুই বোন। বাবা ওকে নিয়ে ২ মাসের জন্য এদেশে এসেছেন। আরেকটা কারণ আছে, যাইনাব অসুস্থ, কিডনিতে কী যেন সমস্যা। বড়ো ডাক্তার দেখানোও একটা উদ্দেশ্য। নাদিয়া আপুর কাছে শুনল অসুখটা নাকি সারে না, লুপাস নেফ্রাইটিস বলে। যেতে ইচ্ছে করছে না তিথির, একদম না। মনে হচ্ছে সারারাত গল্প করা যেত মায়াবতী দুটোর সাথে, ভাঙাচুরা ইংরেজিতে।

সোমালি মেয়েটা ইংরেজি একদমই পারে না, শুধু এসে বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে নাদিয়া আপুকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে। একমনে তিথি আর যাইনাবের কথা শুনছে, বোঝা যাচ্ছে যে ও কিছু বুঝছে না, শুধু চোখ দিয়ে মায়া বিলোতে এসেছে। ওদের সাথে আসরের নামাজও পড়ল তিথি। মাগরিব পর্যন্ত চলল আড্ডা।

বাবা নিতে এসেছে। নতুন অভিজ্ঞতা হলো আজ। বিদেশী কারও সাথে এতক্ষণ কথা হয়নি আগে কখনও। যে কখনও ভিন দেশের ভিন কালচারের সাথে মেশেনি, সে গোঁড়া হয়, আত্মতৃপ্ত হয়। আর যার সুযোগ হয়েছে তার ভাবনা বাড়ে, চিন্তাক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার ফুরসত মেলে। আমি ছাড়া দুনিয়ায় আরও মানুষ আছে, যারা সবাই আমার চেয়ে ভিন্ন। তারা কেউই আমার মতো করে ভাবে না, তাদের হাসি-কান্না-আবেগ-অনুভব কিছুই আমার মতো না। তারাও মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। দুনিয়া ওদেরও, শুধু আমার একার না।

কাল দিনটা ওরা আছে, পরশু চলে যাবে অন্য এলাকায়।

স্বাধীনতার সাতকাহন

জো বায়েদ স্যারের ক্লাস ছিল আজ। ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে স্যার বেশ কড়া করে কিছু কথা বললেন। ইসলামে নারীর মর্যাদা একটা দাসীর চেয়ে বেশি না। নারীকে পরাধীন করে রেখেছে, নারীকে অশিক্ষিত মূর্খ বানিয়ে রেখেছে যাতে পুরুষ ডমিনেট করতে পারে। ইসলাম একটা পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম, পুরুষের তৈরি ধর্ম, সূরা নিসায় পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে মার দিতে—এসব। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা সিজিপিএ নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকে, তাই কেউ প্রতিবাদ করল না। তিথির মনে হলো কিছু একটা বলে, আবার মনে হলো স্যারের কথায় অবশ্য যুক্তি আছে, ১৪০০ বছর আগে সমাজ তো এমনই ছিল, তাই এটাই তো স্বাভাবিক যে সেখানে আধুনিক নারীমুক্তির কনসেপ্ট থাকবে না, তাই না? মেয়েরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, এটা তো সেসময় চিন্তাই করা যেত না। তাই বিধানগুলোও সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে, এ আর এমন কী।

পরদিন আর যাওয়া হয়নি তিথির ও বাসায়। ইচ্ছেও লাগেনি তেমন একটা। অথচ কাল যতক্ষণ ওখানে ছিল, ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না।

হতে পারে যাইনাব-নাদিয়াদের ওর কাছে মনে হয়েছে—পশ্চাদপদ নারী। ওদের কাছে গেলে সেও পশ্চাদপদ হয়ে পড়বে—এমন কোনো ভয় থেকেই পরদিন তিথি গেল না হয়তো, হয়তো না। পরিবেশ... অনেক বড়ো জিনিস, না? সেক্যুলার

শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই ডামাডোলে পড়ে ছটফটায়, স্রেফ পরিবেশের কারণে, স্রেফ পরিবেশ।

তবে স্যারের কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও ডেলিভারিগুলো পছন্দ হয়নি। মনের ভিতর খচ খচ করছে। আসলে কি স্যার যেমন বলেছেন তেমনই, নাকি স্যার জানেন না বলে এমন বলেছেন, ভিতরে ঘটনা আলাদা? স্যার তো ইসলাম-বিশারদ না, তাই তার কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও বিশ্বাস করার আগে নিজে যাচাই করা দরকার। কিছু মানুষ আছে, কীসের বিরোধিতা করে তা-ই জানে না। আমি যে একটা জিনিসের বিরুদ্ধে, সেই জিনিসটা সম্পর্কেও তো ক্লিয়ার থাকতে হবে, হাওয়ার বিরোধিতা করে তো লাভ নেই। এরা হলো হুজুগে, 'প্রচলন'এর বিরুদ্ধে গেলে স্মার্ট হওয়া যায়, মানুষ ঘুরে তাকায়, ওয়াও। স্কুল-কলেজে তার্কিক হিসেবে বেশ নামডাক ছিল। ভাল তার্কিক প্রতিপক্ষের লজিক-স্ট্যান্ডপয়েন্ট সম্পর্কেও ধারণা রাখে। ভাল বিচারক সে-ই যে দু-পক্ষের শুনানি নিয়েই ফয়সালা করে। একপক্ষের কথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া বেইনসাফি-জুলুম। কার কাছে যাওয়া যায়... উমমমম... একজনই আছে... ইয়েস, দ্য নাদিয়া আপু। জবাব দিতে না পারলেও জবাব দেনেওয়ালার খোঁজ আপু দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

— 'স্বাধীনতা...। স্বাধীনতা কী, তিথি? স্ব প্লাস অধীনতা, নিজের অধীন, নিজের মনে যা চায়, যেমন চায় তা-ই করা। একেই স্বাধীনতা বলে। তাই তো? নাকি অন্য কিছু?' কফিতে ছোটো করে চুমুক দেয় নাদিয়া। বৃষ্টি আর ধোঁয়া ওঠা কফি, সোহাগায় সোনা।

— 'হ্যাঁ। আমার জীবন, আমি যেভাবে চাইব সেভাবে কাটবে, সেভাবে চলবে। কারও ইচ্ছেমতো আমি আমার জীবন কাটাতে বাধ্য নই। আমি আমার অধীন।' গলায় উত্তাপ।

— তাই নাকি তিথি? তুমি কি কারও ইচ্ছেমতোই চল না? পরিবারের, সমাজের বা দেশের? কারুর ইচ্ছেমতোই না? স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা যারা শিখিয়েছে, তারাও কি নিজের ইচ্ছেমতোই চলেফেরে? নাকি কোনো কিছুকে মেনে চলে, কোনো কিছুকে মানতে বাধ্য করে অন্যদেরকে? ভেবে জবাব দাও তো।

— 'না না, তা কেন? আইন তো থাকবেই। নাহলে দেশ চলবে কীভাবে?', খুব সহজ একটা কথা, খুব সহজ একটা বুঝ। সহজ কথা যায় না বলা সহজে, যায় না বোঝা সহজে।

— 'এই তো। **পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এবং এগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে**

আইন লাগবে। সোজাসাপ্টা কথা। (*)

রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে, যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো।

সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই তো তুমি করো না।

বিভিন্ন বিষয়ে তুমি পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারো না।

তা হলে তোমার 'স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা' কি বাস্তবসম্মত হলো? নাকি শ্রুতিমধুর ফাঁকা বুলি হলো? 'আমি কারও কথায় চলি না, আমি আমার অধীন'—শোনায় তো দারুণই'।

– 'হুমম', ভাবছে তিথি। ভাবানোটাই দরকার।

– 'আছো তো কিছুক্ষণ, না কি চলে যাবে?', ফালতু সময় নষ্ট করা যাবে না। নইলে অন্য আলাপ পেড়ে বিদায় করে দেওয়াই ভালো। সময়ের বাজারে আগুন। নাড়ী টিপে দেখা শেষ, হাবভাবে মনে হচ্ছে মেয়েটা জানতেই এসেছে।

– 'না আপু, আছি। আপনি ব্যস্ত না তো?

– 'নাহ, তোমার জন্য সব সময় ফ্রি। কী যেন বলছিলাম?

– ঐ যে, বিভিন্ন আইন-কানুন-নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়।

– হ্যাঁ, তা হলে বোঝা গেল, স্বাধীনতা বলতে যে অর্থ, তা বাস্তবে সম্ভব না। আমরা কেউ-ই 'স্ব-ইচ্ছা-অধীন' হতে পারি না। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে **কোনো-না-কোনো নিয়ম-আইন তোমাকে মানতেই হয়।** এমনকি তিথি, তোমার ব্যক্তিজীবনেও তুমি স্বাধীন না।

– 'আমার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও আমি স্বাধীন না? মানে কী?', বিশ্বাস হয় না তিথির।

– বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দেখ, কেউ আইন করে বাধ্য করছে না কাজটা করতে। তারপরও—

➡ 'সিনেমায় নায়িকা শর্ট-কামিজ পরলে আমাকেও পরতে হবে, লং-কামিজ পরলে লং-কামিজ। লেগিং-প্লাজো-জিন্স—যখন **ফ্যাশন** যেটা আসবে, আমাকে পেতেই হবে। আমার মনকে কেউ যেন নিয়ন্ত্রণ করছে।

➡ নতুন নতুন মডেলের ফোন, কেউ ল্যাপটপ, কেউ বা গাড়ি। পুরনোটা বেচে দিয়ে

নতুন মডেল লাগবে। আপ-টু-ডেট থাকতে হবে, **আধুনিক** হতে হবে।

➠ **আর্ট-কালচারের** নামে যা-ই আসে, তা-ই মেনে নিতে হবে—হোক সেটা নগ্নতা, বেডসিন, রেপসিন, সমকামিতা— সবকিছু।

➠ বিশ্বকাপের মাঝে, ভিডিও গেমের মাঝে বুঁদ হয়ে ভুলে যেতে হবে সমাজের সব অসঙ্গতি, রাষ্ট্রের সব জুলুম। ভুলে যেতে হবে আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। কেউ যেন বলছে, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না, মেতে থাকো **খেল-তামাশায়**।

➠ **পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সায়েন্স**-এর নামে যে-কোনো তথ্য সামনে এলে চোখ বুঁজে সাজদা করতে হবে।

➠ একটা **ডিগ্রির** জন্য জীবনের পাঁচ-পাঁচটা বছর এমন কিছু জিনিস শিখে বা না-শিখেই পার করতে হবে, যা বাকি জীবনে আমার আর কাজে আসবে না। জেএসসি-এসএসসি-এইচএসসির মার্কশীটটাই জীবন। মনমতো না হলে আত্মহত্যা করতে হবে।

➠ **খ্যাতির** জন্য একটা মেয়ে কেন অবলীলায় তার সব দিয়ে দেবে প্রডিউসার বা প্রতিযোগিতার হর্তাকর্তাদের?

➠ বলো তো, হাজার কোটি **টাকা** কেন লাগবেই একটা পরিবারের? কীসের দুর্নিবার নেশায় একজন মানুষকে শত কোটি, হাজার কোটি টাকা নিতে হবে দুর্নীতি করে, খেলাপি করে।

➠ **চাকুরি**তে প্রোমোশনের জন্য বা চাকরি হারানোর ভয়ে, লাগলে নিরপরাধকে ফাঁসাতে হবে। মিথ্যা বলতে হবে, চোখ বুঁজে থাকতে হবে। বুক কাঁপা যাবে না ক্রসফায়ারের ট্রিগার টানতে।

➠ **ব্যবসা**য় লাভের জন্য খাবারের মধ্যে বিষাক্ত রঙ, প্যাকেট বড়ো জিনিস কম, ম্যাংগো জুসের নামে কুমড়ো, কাটা চিকন চাল, মজুদ করে দাম বাড়ানো, রমজানে দাম বাড়ানো। কেবল ক'টা টাকা বেশি পাওয়ার আশায়, আমাকে এগুলো করতে হবে।

➠ **'লোকে কী বলবে'**-র খাপে জীবনকে আঁটাতে গিয়ে জীবনটাকেই কেটেছেঁটে বাঁকিয়ে মুচড়ে ঠেসে ঢুকাতে হবে। নইলে স্ট্যাটাস থাকবে না। প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি খেতে হবে। হোম-লোন কার-লোন নিতে হবে। কেন তিথি?', হাঁ করে

শোনে তিথি নাদিয়ার এসব কিম্ভূত কথাবার্তা।

'দেখো তিথি, তুমি ভাবছ তুমি স্বাধীন। কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু করতে হচ্ছে। আর জম্বির মতো তুমি করে চলেছ। যেন অদৃশ্য কেউ তোমাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। তোমার জীবনকে তুমি কন্ট্রোল করছ না, করছে এরা। যে প্রসঙ্গেই বলুক, রুশোর কথাটাই বাস্তবে ঘটে: Man is born free, but everywhere he is in chains. [১] উই আর ইন চেইনস', কফির কাপ দুটো নামিয়ে সরিয়ে রাখল নাদিয়া।

— তা হলে তো আমরা কোনোভাবেই স্বাধীন না? শব্দটাই ভুয়া?

— বাস্তবতা ভেবে দেখলে তাই-ই। **রাষ্ট্রকে দিয়ে, সমাজকে দিয়ে, পরিবারকে দিয়ে তুমি নিয়ন্ত্রিত। তুমি ট্রেন্ড মানতে বাধ্য, ফ্যাশন মানতে বাধ্য, আর্ট-কালচার, কর্পোরেট খেলাধুলা, মিডিয়া, সায়েন্স, ডিগ্রি, টাকা, খ্যাতি, লৌকিকতা, ক্যারিয়ার—এদের দাসত্বে কাটছে আমাদের প্রতিটা দিন। শব্দটাই ফাঁপা। (**)**

— তা হলে ভুয়া শব্দটার এত ব্যবহার কেন? এরকম ফাঁপা অবাস্তব একটা কনসেপ্ট সবাই লালন করে। বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি। কেন?

— কেন শুনবে? শোনো। 'স্বাধীনতা'র এই ধারণাটা এসেছে ইউরোপ থেকে। আমরা ব্যবহার করি—মুক্তি, বন্দিত্বের বিপরীতে ছাড়া পাওয়া, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ- এই জাতীয় অর্থে । কিন্তু **পশ্চিমা সভ্যতা যখন কোনো স্বাধীনতার কথা বলে, তখন তারা অভিধানের অর্থে বলে না। বলে পরিভাষাগত অর্থে, তখন এর মধ্যে লুকোনো থাকে গোটা একটা দর্শন।**

— কীরকম?

— পশ্চিমা দর্শনে—

'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'। [২]

একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনের গড়ে নেবে এবং **জীবন কীভাবে চালাবে সে নির্দেশনা**

[১] মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মালেও, সবখানেই সে শেকলবন্দি।

[২] Jean-Paul Sartre, *L'Être et le Néant.*

নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে। [৩]

আর স্বাধীনতা হলো—
সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)
স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। [৪] (***)
তাদের পরিভাষায় 'স্বাধীনতা' হলো মাপকাঠির স্বাধীনতা—আমার যেটা ভালো মনে হবে, সেটা ভালো। আমার জন্য আমার কাছে যেটা ঠিক মনে হবে, সেটাই ঠিক।

— 'নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করবে... মানে তো...।' ভাবনায় পড়ে গেছে তিথি।

— হ্যাঁ তিথি। মানে তুমি যা ভাবছ তা-ই। পশ্চিমা সংজ্ঞায় তুমি তখনই 'ব্যক্তি' যখন তুমি ভালোমন্দের স্ট্যান্ডার্ড নিজেই ঠিক করবে। আগের মূল্যবোধকে মেনে না নিয়ে। মানে... **সোজা বাংলায় ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের মাপকাঠিকে স্বীকৃতি না দিয়ে, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে নেবে প্রকৃত 'ব্যক্তি'।** Values are not recognaized by you, values are determined by you . [৫]

— 'ওহ হো! একটা শব্দের ভিতর পুরো একটা দৃষ্টিভঙ্গি ঠেসে দেওয়া। শব্দটা তো আর নিরীহ নেই আপু?', বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তিথি। চিন্তার এই ফাঁক-ফোকরগুলোই ধরার জিনিস।

— 'ইউরোপ ব্যক্তি ও স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা দিয়ে খ্রিস্টধর্মকে ঝেড়ে ফেলেছিল রাষ্ট্র-সমাজ-বাজার থেকে। এই সংজ্ঞা দিয়েই মুসলিম বিশ্বকে ইসলাম ঝেড়ে ফেলতে বলা হচ্ছে। **একইরকমভাবে পশ্চিম থেকে যে শব্দগুলো আসে, সেগুলো সবই একেকটা দর্শন বহন করে'**, মুচকি হেসে জবাব দেয় নাদিয়া, মানুষ আপনার কথা বুঝতে পারছে, এটা বিরাট খুশির ব্যাপার কিন্তু। **'যেমন: ব্যক্তি, মানবতা, আধুনিকতা, উদারনীতি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রত্যেকটা কথারই আছে একটা পশ্চিমা সংজ্ঞা, পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমা দর্শন।** যা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে তারা আমাদের বাধ্য করছে। শিক্ষার নামে কারিকুলামের ভিতর দিয়ে এগুলো আমাদের শেখাচ্ছে। আর জাতিসংঘের নামে আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের সংবিধানগুলোতে, আমাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করছে প্রয়োগ করতে', তিথির

[৩] A man becomes an 'individual/person' by exercising his free choice, by freely giving form and direction of his life. – Kierkegaard, father of modern existentialism

[৪] প্রাগুক্ত। দর্শনের সব আলোচনাগুলো এখানে থেকে নেওয়া : Frederick C. Copleston; *The Human Person in Contemporary Philosophy*, *PHILOSOPHY*; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19

[৫] প্রাগুক্ত।

হাত ধরে উঠে পড়ল নাদিয়া। 'বৃষ্টির ছাঁট আসছে, ভেতরে যাই চলো।'

– আর, আমাদের ভুলটা হলো আমরা শব্দগুলো ডিকশনারি মিনিং-এ নিই,প্রচার করি। আসলে এগুলো অত নিরীহ না, যতটা শোনায়। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো তিথি, মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে? সবচেয়ে বেশি?

– 'উমমম...নিজেকে, আপু। সবাই নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমার মতে', ঝটপট উত্তর।

– রাইট। **মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিজেকে। সব কাজ, সব জল্পনা-কল্পনা- পরিকল্পনা সব কিছুর কেন্দ্র সে নিজে। নিজের সুখ, নিজের কমফোর্ট, নিজের ইগো। আমরা নিজেকে খুশি করতে চাই...**(****) । নিজেকে আরাম পৌঁছাতে চাই। নিজেকে রাখতে চাই সবার উপরে। এর পথে যা যা বাধা দেয় তা অস্বীকার করি। সরাতে চাই, নিজেকে খুশি করার পথ করতে চাই নিষ্কণ্টক। সবাই। ঠিক তো?

– ঠিক।

– এবার মিলাও।

কোনো-না-কোনো নিয়মনীতি আইন বিধান তোমাকে ২৪ ঘণ্টাই মানতে হয়। (*) (**)

অথচ, তোমাকে বলা হচ্ছে, তুমি স্বাধীন। অতএব আগের কোনো মূল্যবোধ মানতে তুমি বাধ্য না (***)। এটা বলে তোমাকে ধর্ম থেকে বের করা হলো। ধর্মের দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড সরিয়ে এখন তুমি জিরো পজিশনে আছ।

এখন বলা হলো, নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করো। নিজের নৈতিকতা ঠিক করার সময় তুমি নিজের খুশিকে সামনে রাখলে, মানুষের স্বভাব যেটা। (****)

এবার তোমার খুশিকে প্রবাহিত করে দেওয়া হলো বিশেষ কোনো দিকে। (**) তোমাকে বলা হলো, যত বেশি খ্যাতি তোমার হবে, তত সুখী হবে। যত বেশি ফ্যাশনেবল আধুনিক পণ্য তুমি ব্যবহার করবে, তুমি তত সুখী হবে। এজন্য লাগবে প্রচুর টাকা, যত টাকা তত সুখ। পুঁজিবাদ। এজন্য আছে ডিগ্রি-চাকরি-ব্যবসা, যত উপরে ওঠা যায়। এখন কীভাবে উঠবে, কীভাবে প্রচুর টাকা কামাবে, সেই নৈতিকতা কিন্তু ধর্ম ঠিক করবে না, কে করবে?

— 'করব তো আমি। কারণ আমি তো 'ব্যক্তি', আমি স্বাধীন। হ্যাঁ, আপু', বিহ্বল দেখা যায় তিথিকে।

— ঝামেলা বেধেছে তো? বেধেছে না? টের পেয়েছ?

— হুমমম আপু, বেধেছে। মহা ঝামেলা বেধেছে।

— কী ঝামেলা তুমিই বলো।

— 'কীভাবে প্রচুর টাকা কামানো যায়, সেজন্য যখন নিজেই নৈতিকতা ঠিক করবে; তখনও তো নিজের খুশিকেই সামনে রাখবে। যা ইচ্ছা তা-ই করবে। জুলুম করবে, আরেকজনকে বঞ্চিত করে নিজে উপরে উঠবে। নিজের ইচ্ছা পর্যন্ত পৌঁছতে যা যা করা দরকার তা-ই করবে', যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেউ। 'নৈতিকতার মাপকাঠিই তো তখন নিজের খুশি'।

— তাই তো হচ্ছে এখন। সবাই তো তা-ই করছে। শুরুতে যেগুলো বললাম।

'পুঁজিবাদী [৬] বিশ্বব্যবস্থা এভাবেই খুশি করার মূলো দেখিয়ে আমাকে করে ফেলে গোলাম, অধীন, দাস। কখনও অর্থের, কখনও চাকরির, কখনও লৌকিকতার। কখনও খ্যাতি-ডিগ্রি-মিডিয়ার। কখনও আধুনিকতা, খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি, পপ-কালচারের, ফ্যাশন-ট্রেন্ডের কখনো ক্যারিয়ারের।

মানুষের মগজ থেকে আসা, মানুষের বানানো যে-কোনো সিস্টেমে একপক্ষ হয় জালেম, আরেকপক্ষ হয় মজলুম। কারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজের কথা ভাবে। 'নিজেকে খুশি করা', এই 'নিজ'-কে নিয়ন্ত্রণ না করলে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

যে কথাটা বলার জন্য তোমাকে সারা দুনিয়া ঘুরালাম, সেটা হলো—আসলে 'স্বাধীনতা' শব্দটা দিয়ে পশ্চিম যা বোঝায়, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তোমাকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেউ না কেউ কন্ট্রোল করে। তোমার সজ্ঞানে, বা জ্ঞাতসারে। সবখানেই তুমি কাউকে না কাউকে মানতে বাধ্য। **মানব-রচিত, মানুষের বানানো কোনো-না-কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই। দাসত্ব করছি মানুষের।**

---

[৬] ক্যাপিটালিজম, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশবিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কিনে, আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও পণ্য বানায়। এভাবে চলতে থাকে। এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা। [দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম] মুনাফার চশমায় দুনিয়ার আর সবকিছুকে দেখা। 'Money is the 2nd god'.